আচার্য কৃপালনী কলোনি

(গল্পগ্রন্থ – নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব)

আমার স্ত্রী আমাকে কেবলই খোঁচাইতেছিলেন।

পূর্ববঙ্গে বাড়ি। এই সময় জমি না কিনিলে পশ্চিমবঙ্গে ইহার পরে আর জমি পাওয়া যাইবে কি? কলিকাতায় জমি ও বাড়ি করিবার পয়সা আমাদের হাতে নাই, কিন্তু পনেরোই আগস্টের পরে কলিকাতার কাছেই বা কোথায় জমি মিলিবে? যা করিবার এইবেলা করিতে হয়।

সুতরাং চারিদিকে জমি দেখিয়া বেড়াই। দমদম, ইছাপুর, কাশীপুর, খড়দহ, ঢাকুরিয়া ইত্যাদি স্থানে। রোজ কাগজে দেখিতেছিলাম জমি ক্রয়-বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন। পূর্ববঙ্গ হইতে যে সব হিন্দুরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া চলিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের অসহায় ও উদ্ভ্রান্ত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে বাড়ি ও জমির মালিকেরা একটুও বিলম্ব করেন নাই। এক বৎসর আগে যে জমি পঞ্চাশ টাকা বিঘা দরেও বিক্রয় হইত না, সেই সব পাড়াগাঁয়ের জমির বর্তমান মূল্য সাত-আটশো টাকা কাঠা।

বহুস্থানে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইলাম।

কলিকাতার খুব কাছাকাছি জমির দর অসম্ভবরূপে চড়িয়াছে, আমাদের সাধ্য নাই ওসব স্থলে জমি কিনিবার। তাছাড়া জমি পছন্দই বা হয় কই?

এমন সময়ে আমার স্ত্রী একখানা কাগজ আনিয়া হাতে দিলেন। বলিলেন—তোমার তো জমি পছন্দই হয় না। ঠক বাছতে গাঁ উজাড় করে ফেললে। সিনারি নেই তো কি হয়েছে? এটা পছন্দ হয় না, ওটা পছন্দ হয় না। এবার কি আর কিনতে পারবে কোথাও? যাও এটা দেখে এসো। খুব ভালো মনে হচ্ছে। তোমার মনের মতো। পড়ে দ্যাখো—

আমাকে আমার স্ত্রী যাহাই ভাবুন, হিম হইয়া বসিয়া আমি নাই। সত্যিই খুঁজিতেছি, মনপ্রাণ দিয়াই খুঁজিতেছি। ভালো জিনিস পাইলে আমার মতো খুশি কেহই হইবে না।

বলিলাম—এ কাগজ কোথায় পেলে?

—বাণীদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওরাও জমি খুঁজচে, ওদের দেশ থেকে সব উঠে আসচে ইদিকে, কলকাতার আশেপাশে। ওরা এটা কোথা থেকে আনিয়েচে।

পড়িয়া দেখিলাম—লেখা আছে—

'আচার্য কৃপালনী কলোনি।'

আজই আসুন! দেখুন! নাম রেজেস্ট্রি করুন!!!

'কলিকাতার মাত্র কয়েক মাইল দূরে অমুক স্টেশনের সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে এই বিরাট নগরটি গড়িয়া উঠিতেছে। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। কলোনির পাদদেশ ধৌত করিয়া স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া জাহ্নবী বহিয়া যাইতেছেন। পঞ্চাশ ফুট চওড়া রাস্তা, ইলেকট্রিক আলো, জলের কল, স্কুল, গ্রন্থাকার, নাগরিক জীবনের সমস্ত সুখসুবিধাই এখানে পাওয়া যাইবে। আপাতত পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইলেই নাম রেজেস্ট্রি করিয়া রাখা হইবে।

স্টেশনের নাম পড়িয়া মনে হইল, কলিকাতার কাছেই বটে।

আমার স্ত্রী বলিলেন—দেখলে? ভালো না?

—খুব ভালো। বীণার কাকা জমি নিয়েচেন এখানে?

—না, নেবেন। নাম রেজেস্ট্রি করেচেন। তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা করে পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়ে দাও। কাঠা-পিছু পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে, জমি পরে দেখো। উনিও তো দেখেননি এখনো।

—জমি দেখবো না? আচ্ছা, বীণার কাকাকে জিগ্যেস করি।

বীণার কাকার নাম চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। চিরকাল বিদেশে চাকুরি করিয়াছেন, কোথাও বাড়িঘর করেন নাই, জমি বাড়ি সম্বন্ধে খুব উৎসাহ। আগে-আগে ভাবিয়া আসিয়াছেন কলিকাতায় বাড়ি করিবেন, সম্প্রতি সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন।

চিন্তাহরণবাবু বলিলেন—আসুন। ও কাগজটা আপনি দেখেচেন? ভালো জায়গাই বলে মনে হচ্ছে।

—একটু দূরে হয়ে যাচ্ছে না কি?

—ওর চেয়ে কাছে আর কোথায় পাবেন মশাই?

—তা বটে। স্টেশনের কাছেই, গঙ্গার পারে।

—এখনো সস্তা আছে। এর পরে আর থাকবে না। ইলেকট্রিক আলো, জলের কল, পঞ্চাশ ফুট চওড়া রাস্তা—

—আপনি টাকা পাঠিয়েচেন?

—নিশ্চয়। রসিদ এসে গিয়েচে। আপনি যদি নেবার মতো করেন তবে টাকা পাঠিয়ে দিন।

—জমি না দেখেই?

—ও মশাই, এইবেলা নাম রেজেস্ট্রি করে রাখুন। এর পরে আর পাবেন না। ঠিকানাটা হচ্ছে—দি নিউ ন্যাশনাল ল্যান্ড ট্রাস্ট। রাজীবনগর।

আমার স্ত্রী আমার নামের রসিদ দেখিয়া খুশি হইলেন। বলিলেন—কাঠা-পিছু পঞ্চাশ টাকা। ক-কাঠার জন্যে টাকা পাঠালে, মোটে দু-কাঠা?

—এখন এই থাক। পনেরোই আগস্ট কেটে যাক। সীমানা কমিশনের রায় বের হোক। পরে—

পনেরোই আগস্ট পার হয়ে গেল। সীমানা কমিশনের রায় আর বাহির হয় না। আমার স্ত্রী বলিলেন—একবার জমিটা দেখে এসো না? বীণার কাকাকে সঙ্গে নিয়ে যাও—অনেক লোক আসচে ময়মনসিং পাবনা নোয়াখালি থেকে পালিয়ে। আমাদের পাশের বাড়ির ফ্ল্যাটগুলি সব বোঝাই। এক এক গেরস্ত বাড়িতে তিন-চার ঘর লোক আশ্রয় নিচ্চে।

—কেন নিচ্চে? কোথায় তো কোনো গোলমাল নেই।

—তা কি জানি বাপু, অতশত জিগ্যেস করেচে কে? বীণাদের বাড়িই ওর পিসতুতো ভাই আর বীণার দাদামশায়ের ছোট ভাই এসেচেন ছেলেমেয়ে নিয়ে।

কথাটা মন্দ নয়। নাম রেজেস্ট্রি করিয়াছি, জমি কোথাও যাইবে না। তবে আর এক-আধ কাঠা বেশি জমি রাখিব কি না, ইহাই ধার্য করিবার পূর্বে কলোনিটা একবার চোখে দেখা উচিত নয় কি?

সন্ধ্যার সময় ঝড়ের বেগে বীণার কাকা আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলাম—ব্যাপার কি? এত ব্যস্ত কেন?

—নিয়ে নিন, নিয়ে নিন। জমি কোথাও এতটুকু পাওয়া যাবে না এর পরে। হাজার হাজার লোক আসচে 'ইস্টবেঙ্গল' থেকে। আমার বাড়ি তো ভর্তি হয়ে গেল। জমি এইবেলা যা যেখানে নেবার নিয়ে নিন।

—বলেন কি?

—সত্যি বলচি। কলোনির জমিটা চলুন কাল দেখে আসি। দেখে এসে কিছু বেশি করে জমি ওইখানেই কিনে রাখুন। কত করে দাম নেবে তা কিন্তু এখনো বলেনি। কাল সেটাও ওদের আপিস থেকে জেনে আসি চলুন—

—কোথায় যেন ওদের আপিস?—রাজীবনগর। কোন্নগরের কাছে।

পরদিন কিন্তু আমাকে একাই যাইতে হইল।

বীণার কাকা যাইতে পারিলেন না, তাঁহার বাড়িতে আমার দুটি গৃহস্থ আসিয়া উঠিয়াচেন। তাঁহাদের লইয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

কোন্নগর স্টেশনে নামিয়া রাজীবনগর যাইতে মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। স্টেশনের সংলগ্ন তো নয়ই, পাকা আড়াই মাইল দূরে। কাঁচা রাস্তা কাদায় ভর্তি। যেমন জঙ্গল তেমনি মশা।

খোঁজ করিয়া এক গ্রাম্য ডাক্তারবাবুকে জমির মালিক হিসাবে পাওয়া গেল। তিনি একখানা টিনের ঘরে রোগীপত্র দেখিতেছিলেন, যাহাদের সংখ্যা আর যাহাই হউক ডাক্তারের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু নহে। আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কাকে চাচ্চেন?

বিনীতভাবে বলিলাম—আপনারই নাম মণীন্দ্র ঘটক? আমি যশোর থেকে আসচি। আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—

ডাক্তারবাবু নিস্পৃহভাবে বলিলেন—ও—

এবং পরক্ষণেই রোগীদের দিকে মনোযোগ দিলেন পুনরায়।

আমি বড় আশা করিয়াই গিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে মাত্র নয় মাইল দূরে স্টেশনের গায়ে জমি, এ জমিটা লইতে পারিলে নানাদিক দিয়াই সুবিধা। কিন্তু জমির মালিক অত নিস্পৃহ কেন? তবে কি বিক্রয় করিবেন না স্থির করিলেন?

প্রায় মিনিট দশেক কাটিয়া গেল।

দাঁড়াইয়াই আছি, কেউ বসিতেও বলে না।

আবার সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলাম—আমি—মানে এই ট্রেনেই আবার—মানে—ডাক্তারবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন—কি বলচেন?

—জমিটা—

—কোন জমি?

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—স্টেশনের সংলগ্ন—কৃপালনী কলোনি—

—ও—

আবার রোগীদিগের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। আমিও অতটা সুবিধাসম্পন্ন যে জমিটুকু, তাহার খোদ মালিককে বিরক্ত করিতে সাহস করিলাম না।

দশ মিনিট কাটিল।

এবার ডাক্তারবাবুই আমাকে বলিলেন—তা বসুন।

বসিবার অনুমতি পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। অনেকক্ষণ হইতে খাড়া দাঁড়াইয়া আছি। বসিবার মিনিট দুই পরে আমি বলিলাম—ইয়ে—জমিটার কথা—মানে—

ডাক্তারবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন—কী বলচেন?

—জমিটার কথা বলছিলাম। মানে—একবার দেখলে ভালো হয়। এদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে—

—জমিটা দেখবেন? ও কার্তিক-কার্তিক! যাও এই বাবুকে জমিটা দেখিয়ে আনো।

ভাবিলাম, তাই তো ইহা আবার কি, ডাক্তারখানার পাশের ঘরে বড় বড় হরফে ইংরাজিতে লেখা আছে বটে, "দি নিউ ন্যাশনাল ল্যান্ড ট্রাস্ট।

গঙ্গার ধারে বিরাট ভূখণ্ড লইয়া এই উপনিবেশ গড়িয়া উঠিবে—কিন্তু গঙ্গা হইতে রাজীবনগরই তো দেখিতেছি আড়াই মাইল দূরে। তবে ইহাও হইতে পারে, দি নিউ ন্যাশনাল ল্যান্ড ট্রাস্টের আপিস এখানে, জমি গঙ্গার ধারে!

কার্তিক নামধেয় লোকটি ডাক্তারবাবুর আহ্বানে এইমাত্র আসিয়াছিল। বলিল—কোন জমি বাবু?

—আরে, ওই যে বরোজের পশ্চিম গায়ে—

—জমি?

—আ মলো যা! হাঁ করে সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? হ্যাঁ, জমি। কোথাকার ভূত?

বাড়ির চাকরটা বোধ হয় বোকা, প্রভুর এমন মূল্যবান ভালো বহুবিজ্ঞাপিত ভূমিখণ্ডের সমন্ধে কোনো খবর রাখে না কেন?

আমি পথে বাহির হইয়া বলিলাম—চলো—

লোকটা পশ্চিমদিকে যাইতেছে দেখিয়া বলিলাম—ওদিকে কোথায় যাচ্চো? ইস্টিশানের কাছে যে জমি—কৃপালনী কলোনি—

—ইস্টিশানের কাছে কোনো জমি নেই বাবু।

—আলবৎ আছে। তুমি কোনো খবর রাখো না।

—না বাবু, কোনো জমি নেই ওদিকে।

—শোনো, ইস্টিশানের গায়ে—কাগজে যে জমির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চাশ টাকা খরচ করে নাম রেজেস্ট্রি করতে বলা হয়েছিল যে জমির জন্যে। আমি নাম রেজেস্ট্রি করে রেখেছি—রসিদ আছে পকেটে—

—এ কথাটা আপনি ওখানে বল্লেন না কেন বাবু? আমি তো আর কোনো জমির সন্ধান জানি না। কালও তো এক বাবু এসেছিলেন, তিনিও নাম রিজিস্টারি করে নিয়ে গেলেন।

—জমি দেখেননি?

—না। ডাক্তারবাবু বল্লেন, জমি দেখে যাবেন সামনের রবিবারে।

—বেশ, আমায় নিয়ে চলো—

—বাবু—

—কি বলে আবার?

—আপনি জমি দেখতে চান?

—কি বলে আবোল-তাবোল! জমি দেখবো না তো কি?

—আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি জিজ্ঞেস করে আসি।

আমি বিরক্তি হইয়া নিজেই আবার ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম। বলিলাম—আপনার চাকর জানে না আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে।

এবার ডাক্তারবাবু দেখিলাম, আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। তিনিও জমির জন্যই আসিয়াছেন মনে হইল। কারণ তিনি পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া নাম রেজেস্ট্রি করিলেন। ডাক্তারবাবু রসিদ কাটিয়া দিলেন দেখিলাম। লোকটির সঙ্গে আরো কি কথা হইয়াছে জানি না, টাকা দিয়া রসিদ লইয়া লোকটা চলিয়া গেল।

আমাকে ডাক্তারবাবু বলিলেন—জমি দেখবেন? আচ্ছা চলুন, আমিই যাচ্ছি।

পরে আমাকে দুর্গন্ধময় জল-ভর্তি নালা, কচুবন, ভাঙা চালাঘর প্রভৃতির পাশ দিয়া কোথায় কোন অনির্দেশ্য রহস্যের দিকে লইয়া যাইতে লাগিলেন, তিনিই জানেন।

আমি একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিলাম—তিনি বোধ হয় ভুলিয়া যাইতেছেন, এ জায়গাটি স্টেশনের খুব কাছে। স্টেশনের সংলগ্ন বলিয়া বিজ্ঞাপনে আছে—

ডাক্তারবাবু আমার দিকে কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—আপনার তো আইডিয়া দেখছি বেশ। স্টেশন-সংলগ্ন মানে কি একেবারে কোন্নগর ইস্টিশানের টিকিটঘরের পাশে হবে মশাই?

বলিতে পরিতাম, 'সংলগ্ন' বলিতে দুই মাইল দূরবর্তীই কি বোঝায়? কিন্তু না, দরকার নাই। পূর্ববঙ্গের অসহায় হিন্দু আমি, এখানকার জমির মালিকের সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া করিব না। স্থান পাওয়া লইয়া কথা। চটিয়া গেলে জমি না দিতেও তো পারে।

বিনীতভাবে বলিলাম—কলোনি কতদূর?

—মাইলখানেক দূরে।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—বলেন কি! তবে সাড়ে তিন মাইল দূর পড়লো স্টেশন থেকে। এর নাম 'সংলগ্ন'? এ তো কখনো শুনিনি—

ডাক্তারবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। বলিলেন—না শুনেচেন কি করবো? কিন্তু আপনাকে বলচি, কলোনির এক ইঞ্চি জমি পড়ে থাকবে না। সব নামে নামে রেজেস্ট্রি হয়ে যাচ্চে। আপনার না ইচ্ছে হয়, না নেবেন। তবে কি দেখতে যাবেন, না দেখবেন না?

—চলুন যাই।

পকেট হইতে একগোছ চিঠি বাহির করিয়া ডাক্তারবাবু আমার নাকের কাছে ধরিয়া বলিলেন—এই দেখুন। মনি অর্ডারে টাকা আসচে অফিসে, রোজ একগোছা চিঠি আসচে, আপনি দেখুন না মশাই। না দেখলে ঠকবেন এর পরে। তবে আপনি না নিলে জোর করে তো আপনাকে দেওয়া হবে না—

রাস্তায় ভীষণ কাদা। একটা গোয়ালা-পাড়ার ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম, মহিষ ও গরুর বাথান চারিদিকে। অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাতাসে। ইহাতে মশা বিন বিন করিতেছে। খানিক-দূর গিয়া একটা অবাঙালি কুলি বস্তি, যেমন নোংরা, তেমনি ঘিঞ্জি। তারপরে আবার জঙ্গল বাঁশবন আর ডোবা।

মাইলখানেক দূরে জঙ্গলের একপাশে রাস্তার ধারে একটা টিনের সাইনবোর্ডে বড় বড় করিয়া লেখা আছে—'আচার্য কৃপালনী কলোনি।

এখানে আসিয়া ডাক্তারবাবু দাঁড়াইলেন। সামনের দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—এই—

চারিদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিস্ময়বোধের শক্তিও যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইহারই নাম, আচার্য কৃপালনী কলোনি। এই সেই বহুবিজ্ঞাপিত ভূখণ্ড? কোথায় ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে? কোথায় সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য? পঞ্চাশ ফুট চওড়া রাস্তা, ইলেকট্রিক আলো, জলের কল প্রভৃতি ছবির সঙ্গে এই অন্ধকার বাঁশবন, কচুবন আর মশাভরা ডোবার খাপ খাওয়াইতে অনেক চেষ্টা করিলাম; মনকে অনেক বুঝাইলাম,রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কি ছিল? অমুক কি ছিল? কিন্তু পারিয়া উঠিলাম না। তাহা ছাড়া এখানে ডাঙা-জমিই বা কোথায়? সব তো জলেডোবা আর জলের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে বনকচুর ঝাড়।

সে কথা বলিয়া লাভ নাই।

ডাক্তারবাবু গর্বের সহিত বলিলেন—সাড়ে ছ'শো করে কাঠা, তাই পড়তে পাচ্ছে না! সব প্লটের নাম রেজেস্ট্রি হয়ে গিয়েচে মশাই।

কিন্তু ‘প্লট” বলিতে জমির টুকরা বোঝায়, এখানে জমিই যে নাই, এ তো সবই জলাভূমি। পুণ্যতোয়া স্বচ্ছসলিলা জাহ্নবী ইহার ত্রিসীমানায় আছেন বলিয়া মনে হইল না।

বলিলাম—গঙ্গা এখান থেকে কতদূর?

—বেশি নয়। মাইলখানেক হবে কিংবা কিছু বেশি হবে—

তাই বা কি করিয়া হয়? গঙ্গা এখান হইতে চারি মাইলের কম কি করিয়া হয়, বুঝিলাম না।

সে যাহা হউক, তর্ক করিলাম না। ফিরিয়া আসিলাম। এই জলাভূমি আর কচুবনই হয় তো ইহার পর পাইব কিনা কে জানে? মন ভীষণ খারাপ হইয়া গেল।

বাড়ি আসিতেই স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁগা, কি রকম দেখলে? ভালো?

বলিলাম—চমৎকার!

—বলো না, কি রকম জায়গা? গঙ্গার ওপর?

—সংলগ্ন বলা যেতে পারে।

—বেশ বড় রাস্তা করেচে?

—মন্দ নয়, বড়ই।

বীণার কাকাকে সেদিন কিছু বলিলাম না। পঞ্চাশ টাকা জলে ফেলিলাম বটে, কিন্তু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পূর্ববঙ্গই ভালো। আর জমি খুঁজিব না ঠিক করিয়া ফেলিলাম।

পরদিন র‍্যাডক্লিফের রায় বাহির হইল।

আমাদের দেশ পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে।